মহীতোষ বিশ্বাস

রচনা সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা

অভিষেক বিশ্বাস ঋত্বিকা বিশ্বাস

পুনশ্চ

সূচিপত্র

আমার সময় আমার গল্প ১১-১২৬

সিঁদ ১৩

জৈব ১৮

স্মৃতি তীর্থে ২৩

ফটিক ব্যাপারীর হাট ৩২

সুদাস জোগালের সুখ-দুঃখ ৩৮

চেরাচোখের নজর ৪২

রাখালবাঁশির রোগ ৪৭

জয়কেষ্ট ও তার পিতৃপুরুষ ৫২

একটি অবসরের গল্প ৫৯

সেতুর উপর একা ৬৭

হিসাব ৭১

জাতের করাত ৭৭

মাস্টার মশাই ৮২

সেলাই মেশিন ৮৫

পোক-পতঙ্গ কথা ৮৯

বর্শামুখ ৯৭

সহজ পাঠ ১০২

কেদার বদরীর অঙ্গনে (ভ্রমণ-কথা) ১০৫

যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখের পথে (ভ্রমণ কথা) ১১৬

বয়স্ক শিক্ষা ১২৩

নির্বাচিত কবিতা ১২৭-২৫৪

আমার পৃথিবী ১২৯; হৃদয়-লীনা ১৩০; সম্ভবা ১৩০; সেদিন যখন ১৩১; জাগবেই ১৩৩; নতুন কবিতা ১৩৫; সেদিনে ১৩৭; এপার-ওপার ১৩৭; একান্ত ১৩৮; বিস্মরণ ১৩৮; ঢেউ ১৩৯; প্রেসিডেন্সিতে ছুটি ১৪০; কাজল-মন ১৪১; তবু আসি ১৪১; সেইখানে ১৪২; মরানদী : লাল মেঘ ১৪৪; দু'টি কথা ১৪৫; একা ১৪৬; উত্তরণ ১৪৬; ধূপ হয়ে ১৪৭; স্বীকৃতি ১৪৭; কথাকলি ১৪৮; নীল রাত : কালো চোখ ১৪৯; সমুদ্র-মানিক ১৫০; না-বলা কথা ১৫১; চিরদিন ১৫১; ইচ্ছার অপমৃত্যু ১৫২; যন্ত্রণা ১৫৩; তিন স্বপ্ন ১৫৪; জানবে না ১৫৪; দূরযানী ১৫৫; বিল ১৫৬; এখানে ১৫৭; বেড়িয়ে নে ১৫৮; অষ্টাদশী ১৫৮; দিনের আলোয় ১৫৯; একটি প্রত্যয় ১৫৯; চক্রবাল ১৬১; এখনও ১৬১; দেয়াল ১৬২; তুলির স্বপ্ন ১৬৩; ইচ্ছার

কুসুম ১৬৩; নদীকে ১৬৪; জানো না ১৬৫; চতুর্দশপদী ১৬৫; মগ্ন অরূপ ১৬৬; রূপান্তর ১৬৭; যদি জানতে ১৬৭; একটি পতঙ্গের সুখ ১৬৮; দিনরাত্রির কথা ১৬৮; শিলীভূত নক্ষত্র ১৬৯; উদ্ভাস ১৭০; মুগ্ধতার মুখ ১৭১; লগ্ন ১৭১; রবীন্দ্রনাথ ও একটি অনুভব ১৭২; একটি অনুভব ১৭৩; সন্ধি ১৭৩; এমন বাদল দিনে ১৭৪; আলোয় ফিরে যাব ১৭৪; দ্বিতীয় জীবন ১৭৫; নাম ১৭৬; মেঘে মেঘে বেলা যায় ১৭৬; সুবর্ণরেখা : সকাল ১৭৭; সূর্যের স্বদেশ ১৭৮; দৃশ্য ১৭৮; একটি দেহকে ভেবে ১৭৯; আমি যদি ১৮০; কী যে সুখ পেলে ১৮০; অন্ধকার ১৮১; একটি শপথের জন্মলগ্নে ১৮২; অবশিষ্ট চেতনায় ১৮৩; সূর্য-প্রণাম ১৮৩; তোমার প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে ১৮৪; শৈশবে যৌবনে ১৮৫; রাস্তা পেরিয়েই ১৮৬; ঈশ্বরীকে প্রার্থনা ১৮৬; সেই রমণীরা ১৮৭; কিছুই আশ্চর্য নয় ১৮৭; প্রার্থিত সঞ্চয়ে ১৮৮; পুতুল ও পুতুল তোমার ১৮৯; অসুখ ১৯০; হেঁটে যাও ১৯০; আশ্বিন ১৯১; আমরা যারা ১৯২; এগারোখান : একটি প্রণাম ১৯৩; স্বদেশ ১৯৫; নিহিত বৈভব ১৯৫; অপেক্ষা ১৯৭; পতিত সংসার ১৯৭; নিরর্থকতায় ১৯৮; কথা ১৯৯; একটি সন্ধিক্ষণ ১৯৯; বাঁচা ২০০; থাক ২০১; এসো ২০১; মুছে নেব ২০২; জীবন ২০৩; শায়ক ২০৩; নির্জন ২০৪; মেলানো ২০৫; দিন যায় ২০৫; অতঃপর ২০৬; কোন্ কথা ২০৭; অহং ২০৭; তৃপ্তি ২০৮; এবং আশ্চর্য ২০৯; বাঁচে ২১০; পরিণাম ২১০; লড়াই ২১১; হতাশা ২১১; খেলা ২১২; জমা ২১৩; হিসাব ২১৪; অবন্ধন ২১৪; সত্য ২১৫; ভাসমান ২১৬; স্বভাবে ২১৬; ভার ২১৭; খোঁজা ২১৮; বেঁচে থাকা ২১৮; বোঝা ২১৯; নীলকণ্ঠ ২২০; অক্ষমা ২২০; মেঘ ২২১; ফুল ২২২; নদী ২২২; ঋজু ২২৩; পথ ২২৪; বৃষ্টি ২২৫; দৃশ্য ২২৫; রং ২২৬; বাগান ২২৭; অদল-বদল ২২৭; মূঢ়তা ২২৮; ঠিকানা ২২৯; মায়াজাল ২২৯; অমানিশা ২৩০; সংসার ২৩১; গতি ২৩১; ভুবন ২৩২; দূরে কাছে ২৩৩; আত্মক্ষয় ২৩৪; উপাখ্যান ২৩৫; যাত্রী এক ২৩৬; হেরো ২৩৬; এলে না ২৩৭; ব্যাপার ২৩৮; এই তো বেশ ২৩৮; রামকৃষ্ণদেবকে মনে রেখে ২৩৯; নরেন ২৪০; বহমান ২৪১; ১৫ই আগস্টের ভাবনা ২৪২; হলুদ বাগানে ২৪৩; লাউডগাটি ২৪৪; বাবাসাহেব ২৪৪; বয়েস ২৪৫; কবি (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে) ২৪৬; শব্দ ২৪৭; শেখায় ২৪৭; দাঁড়া ২৪৮; পড়তাই ২৪৯; বাঁচো ২৪৯; বিদ্যামন্দিরে বিদায় দিনে ২৪৯; কবে ২৫১; দাও ২৫৩

ভ্রষ্টকুসুম ও অন্যান্য ২৫৫-৩৮২

রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিবাদ ২৫৭

সতীনাথ ও তারাশঙ্কর : একটি তুলনামূলক পাঠ ২৬৭

মহাশ্বেতা দেবী ২৭৪

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ২৮১

দাম্পত্য-জীবনের আলোকে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ২৮৮

আলোর দিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ ২৯৪

কথামৃতে গল্পকার শ্রীরামকৃষ্ণ ৩০৩

স্বামীজিকে নিয়ে লেখা হল না ৩১৯

ভগিনী নিবেদিতা : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৩২৪

ভ্রষ্ট কুসুম ৩৩৮

কল্যাণ ৩৪১

একটি বিরল ব্যক্তিত্ব ৩৪৯

কানাইদা ৩৫৩
সতীশবাবু—আমার মাস্টারমশাই ৩৫৫
একটি স্মরণ ৩৫৭
বাক্‌ড়ী স্কুল ও কিছু উপকথা ৩৫৯
একটি চিঠি ৩৬৩
অবর বেলায় পাড়ি ৩৬৬
এক যে ছিল পুতুল ৩৭০
বাংলা লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে ৩৭২

জীবনানন্দ দাশ ৩৮৩-৪৫০

বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা ৪৫১-৫৯৬
উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ৪৫৩
বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার উৎস সন্ধানে ৪৬১
বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক ৪৮৩
উনিশ শ পঞ্চাশোত্তর বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস ৫৬৪
উপসংহার ৫৯৪

দিন এল, দিন গেল ৫৯৭-৭১০

পরিশিষ্ট ৭১১-

সিঁদ

কুসুমকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়ালো নিতাই। অনেকক্ষণ থেকেই বসে আছে। খানিকক্ষণ আগে সাড়ে চারটের ডাউন ট্রেনটা চলে গেলো। মনে মনে একটু বিরক্তই হচ্ছিল। তবু যেন চলে যেতে পারছিল না। ঠিকই জানে নিতাই যে, যেভাবেই হোক, একবার না একবার আসবেই কুসুম। ওর কথার বড়ো একটা নড়চড় হয় না। কুসুমকে আসতে দেখেই একটুখানি এগিয়ে গেলো নিতাই। বনতুলসী আর আকন্দ গাছের ছোটো ছোটো ঝোপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে কুসুম। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কেউ ওকে দেখছে নাকি — লক্ষ করছে। মেয়েটা সত্যিই বড়ো ভিতু। ওর ঐ ভয় ভয় চোখে এদিক ওদিক তাকানোটা বেশ লাগে নিতাইয়ের। নিজের পরে একটা অহংকার আসে। পৌরুষের অহংকার। একবার ওর কাছে এসে পড়লেই যেন কুসুমের আর কোনা ভাবনা থাকবে না। ভয় থাকবে না। ভাবতে ভালো লাগে বইকী নিতাইয়ের!

কুসুম কাছে এসে দাঁড়ায়। একটুখানি হেসে ফেলেই বলে নিতাই, — 'এতো দেরি করলা ক্যানো? এক্‌কেয়ারে ভাবিয়ে মারছস'।

নিতাই বরিশালের মানুষ। কথার টানগুলো এখনো ভালো করে যায়নি। আগে শুনে হাসত কুসুম। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করত। খুব ভালো করে কথা যে সেও বলতে পারে তা নয়। তবু নিতাইয়ের বরিশেলে টানটা শুনে প্রথম প্রথম ওর হাসিই পেতো। এখন আর হাসে না। এখন মনে হয়, যেন ওরকম কথা না বললে নিতাইকে মানাতোই না।

নিতাইয়ের কথার জবাবে কুসুমও একটুখানি হেসে জবাব দেয়—'আর বলো ক্যানো নিতাইদা, দ্যাখোনি তো আমার মামীরে। সারাডাক্ষণ শুধু ট্যাঁ ট্যাঁ করতেই আছে। কত কষ্ট করে যে একটুখানি আসতে হয়।'

নিতাই আস্তে আস্তে কুসুমকে কাছে টেনে নেয়। সহানুভূতি মেশানো গলায় বলে—'ওখানে তর বড়ো কষ্ট হইতাছে—নারে? বুঝি তো হক্কলই রে কুশি! কিন্তু কী করুম বল দিনি?'

কুসুম কোন জবাব দেয় না। নিচু হয়ে নখ খোঁটে। কথা বদলাবার চেষ্টা করে। বলে—'আমাদের বাড়ি তো একবারও গেলে না নিতাই দা।'

নিতাই এবার একটুখানি হেসে বলে—'যামুরে যামু। যাওনের লেগ্যে অতো ভাবনা ক্যান? তরে যেদিন ফুলের মালা পরাইয়া ঘরে আনতে পারুম—সেদিন ঠিকই যামুরে।'

কুসুমের সারা মুখে লজ্জার আবির ছড়িয়ে পড়ে। ষোলো বছরের প্রথম রং লাগা লজ্জার আবির! উদ্বেল প্রেমের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। একটা নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির মধ্যে যেন হারিয়ে যায় দুজনে। হঠাৎ নিতাই বলে ওঠে—'একবার চোখ বুইজা হাত পাত্ দেখি।'—

কুসুম কৌতুক বোধ করে। অবশ্য এরকম ব্যাপার যে আজ নতুন, তা নয়। যেদিনই দুজনের দেখা হয়, সেদিনই প্রায় নিতাই এইরকম একটা কাণ্ড করে বসে।

নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুম বলে—'আজ আবার কী এনেছো? তোমারে এতো করে কইনি নিতাইদা যে—এমনি করে পয়সাগুলো বাজে খরচ করবা না! আমার কথাডা কি তুমি শোনো না?

হেসে ফেলে নিতাই। কুসুমের হাত দুখানি কাছে টেনে নেয়। পকেট থেকে একজোড়া ঝকঝকে ফুলকাটা প্লাস্টিকের চুড়ি বের করে পরিয়ে দিতে দিতে বলে—'এ্যাঁ, এখনই এতো, এখনো গিন্নি অইবার পারোনি, তাইতেই ধমক মারছোস্—! এর পরে তো আর রক্ষেই রাখবা না দেখছি।'

চুড়ি দুটো পরানো হয়ে গেলে ধরা গলায় নিতাই বলে 'রাগ করিস ক্যান কুসুম! তরে আমার যে কত কিছু দেবার সাধ হয়। কীই-বা তার দিতে পারছি বল্! এ রাঙা চুড়ি দুগ্যা মোর ভালবাসার দান। এয়ারে তুই ফিরাস্নে কুসুম!'

গভীর আনন্দে কুসুমের চোখ দুটি যেন বন্ধ হয়ে আসে। নিতাইয়ের ভালবাসার দান!—নেবে বৈ কী সে! সমস্ত দেহমন জুড়ে যেন অনাগত ভবিষ্যতের একটা মধুর শিহরণ খেলে যায়। নিতাইয়ের হাতের পরে হাত দুখানি রেখে বলে—'সত্যিই নিতাইদা, বড়ো ভালো চুড়ি দুডো। কেমন সুন্দর ফুলকাটা!'—

নিতাইয়ের হাতের মাঝখানে অনেকক্ষণ ধরা থাকে কুসুমের নতুন চুড়ি পরা হাত দুখানি।

প্যাঁজা তুলোর মতো কুয়াসা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। আস্তে আস্তে দুটি প্রাণী দুদিকে চলে যায়। শীতের সন্ধ্যা নেমে আসে। রেললাইনের দুপাশ দিয়ে রিফিউজি ক্যাম্প। ছিন্নমূল মানুষগুলোর কোনো মতে একটুখানি মাথা গোঁজার আশ্রয়। আবছা অন্ধকারে ক্যাম্পগুলো গা ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। নিতাই ফিরে আসে ক্যাম্পে। ছেঁড়া চাটাইটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে এলোমেলো সব ভাবনা। ভেবে যেন কোনো কূল পায়না। আজ প্রায় বছরখানেক হলো পরিচয় হয়েছে কুসুমের সঙ্গে। মেয়েটার পরে সত্যিই যেন বড়ো মায়া পড়ে গেছে। মামার সংসারে থাকে। মামি বাতের রোগী। তার উপরে একগাদা ছেলে মেয়ে। সবসময়ে খিটিমিটি লেগেই আছে। অবশ্য কুসুমের মামা এখন আর ক্যাম্পে থাকেন না। কী যেন একটা চাকরি পেয়েছে। ঐদিকের রেলপুলের ওপারে যে কলোনিটা গড়ে উঠেছে, ঐখানে কোথায় মোটামুটি একটা বাড়িও নাকি করেছেন। অনেকদিনই বলেছে কুসুম নিতাইকে যাবার জন্যে। কিন্তু নিতাই যায়নি। কী পরিচয় নিয়ে যাবে! একটা কিছু তো বলতে হবে গিয়ে। নিতাইয়ের মনে বড়ো সাধ রয়েছে, একটুখানি কোথাও দাঁড়াতে পারলেই একেবারেই কুসুমের মামার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই অমত করবেন না কুসুমের মামা। না হয় খুলেই বলবে, সে নিজেদের ভালবাসার কথা। যেমন করে হোক, কুসুমকে ঘরে আনতেই হবে। কুসুম কে না হলে চলবে না নিতাইয়ের। রেলপুলটার নীচে ওরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখা করে। আর যতবারই কুসুমকে দেখেছে নিতাই—ঐ এককথাই মনে হয়েছে—কুসুমকে না হলে চলবে না তার। ঘর যদি বাঁধে তো কুসুমকে নিয়েই বাঁধবে।

একটা মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে চাটাইয়ের পরে পড়ে থাকে নিতাই। কুসুমের সেই করুণ মুখখানা বারবার মনে পড়ছে। একটা লতার মতো তাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠতে চায় কুসুম। নিতাইয়ের উপরে ভরসা করেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে সে। যেমন করে হোক, এ বিশ্বাসের মূল্য দেবে বৈকী নিতাই। আজকের সেই চুড়ি পরিয়ে দেবার সময়টার কথা মনে পড়ে। আরো যেন ভালো লাগে কুসুমকে। কুসুমের সেই হিসেবি মানুষের মতো কথাগুলো মনে পড়তেই হাসি পেয়ে যায়। ঐটুকুতো মেয়ে! তার আবার কথা শোনো। ধমক দিয়ে বলে কী না যে—পয়সাগুলো বাজে খরচ করো না। একশোবার করবে। হাজারবার করবে নিতাই। আর বাজে খরচই বা কিসে? কুসুমকে দুটো চুড়ি, একখানা চিরুণি কিনে দিয়ে যদি তার বাজে খরচ হয়তো হোক না। তবে আগের চেয়ে হিসেবি একটু হয়েছে বৈ কী নিতাই। কিছু কিছু পয়সাকড়ি জামানোর দিকে মন দিয়েছে। কুসুমকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হলে পয়সা তো লাগবেই। ক্যাম্পের মধ্যেই তাই নিতাই ছোটোখাটো একটা বিড়ির

দোকান করেছে। তামাকপাতা, কাঁচি, শুখা কিনে এনে নিজেই বিড়ি বাঁধে। নিজেই বিক্রি করে। ক্যাম্পের লোকেরাই কেনে। মোটামুটি মন্দ বিক্রি হয় না। তবে ওতে আর ক পয়সা থাকে! দু চারটা কাঁচা টাকা ঘরে আনবার আরো একটা পথ জানা আছে নিতাইয়ের। রাত্রির ঘন অন্ধকারে ওর কালো দীর্ঘ দেহটা সাপের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ওর হাতের ছোঁয়া পেলে সিঁদকাঠি নাকি জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে সিঁদকাঠির স্পর্শে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই শক্ত দেয়ালগুলোর গায়ে মসৃণ একটা গর্ত হয়ে যায়। অবলীলায় ঢুকে যাবার উপযুক্ত সুড়ঙ্গ পথ। বিদ্যেটা নিতাই শিখেছিল ওর ঠাকুর্দার কাছ থেকে। দেশে থাকতে অনেকদিনই ঠাকুর্দার সঙ্গে বেরোত। তবে নিতাইয়ের বাপের মত ছিল না। বাপকে আর ছেলেকে গালাগালি দিত। পরের সর্বনাশ করলে নির্বংশ হবার ভয় দেখাতো। নাতি ঠাকুর্দা চুরির টাকা ট্যাঁকে গুঁজে মুচকি মুচকি হাসতো। বাপ মারা যাওয়ার পর পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে ভিড়ে এ বঙ্গে চলে এসেছে নিতাই। সরকারি ক্যাম্পে থাকে। কিছুদিন হলো বিদ্যেটা একেবারেই চাপা পড়ে ছিল। অচেনা জায়গা। তাছাড়া ক্যাম্পের মধ্যে ও বিদ্যেটা ফলিয়ে কী-ই বা আর পাওয়া যায়। কিছুদিন হলো রেলপুলের ওপারে বড়ো একটা কলোনি গড়ে উঠেছে। অনেক ভদ্দরলোক থাকে ওখানে। প্রায় সকলেই চাকরি বাকরি করে। গেলে একেবারে খালি হাতে ফিরতে হয় না। কয়েকদিন গিয়েছেও নিতাই। তবে আজকাল আর তেমন যেন উৎসাহ পায় না কাজটায়। কুসুম জানে না। শুনলে হয়তো কুসুম ঘেন্না করবে ওকে। নাঃ কাজটা ছেড়ে দেবে নিতাই। ওতে ইজ্জত নেই। আজকে কুসুমকে চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে। সেই হাত দিয়েই রাতে আবার সিঁদকাঠি ধরতে হবে! ভাবতেই মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে যায় নিতাইয়ের। কিন্তু উপায়ও তো নেই। দিনকাল যা পড়েছে! কুসুমকে নিয়ে কোথাও একটুখানি দাঁড়ানোর জায়গা তো করতে হবে। তবে, আর কিছু টাকা হাতে এলেই এসব ছেড়ে দেবে নিতাই। দোকানটা বড়ো করবে। দুটি তো মানুষ। ওতেই চলে যাবে ওদের। অসৎপথে আর যাবে না। ভালো হবে নিতাই! শান্ত পরিচ্ছন্ন একখানা ঘর! কুসুমের মতো বউ!—

ভবিষ্যতের সেই সুখটার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে নিতাই।

গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল নিতাই। ছোটো একখানা কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরা। হাতে সিঁদকাঠি। কালো চাদরটা গায়ে জড়িয়ে চারদিকটা একবার দেখে নেয় ভালো করে। শীতের রাত্রি। কোনো মতে মুড়ি সুড়ি দিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে সবাই। নিতাই সতর্ক পায়ে বেরিয়ে আসে। রেললাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই রেলপুলটার উপর এসে পড়লো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুখানি ভাবল। তারপর পুলটা পার হয়ে ঢুকে গেল কলোনির মধ্যে। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে। পর পর কয়েক দিন চুরি হওয়াতে লোকগুলো এখন অনেক সাবধান হয়ে গেছে। এদিকটায় এখন সুবিধে হবে না বুঝে নিতাই ওদিকটার ফাঁকা পথ দিয়ে আরো অনেকখানি ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলো। একটু কুয়াশা পড়েছে। কুয়াশাটা আরো একটু ঘন হয়ে পড়লেই সুবিধে। চলাফেরায় আরো একটু স্বচ্ছন্দ হতে পারতো। বাঃ, এদিকটা তো একেবারেই নিঝঝুম। সারা পাড়াটা যেন ঘুমে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে! পথটা ছেড়ে দিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজা ঢুকে গেল পাড়ার মধ্যে। এদিক-ওদিকের সব বাড়িগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। ফাঁকা জায়গা। অন্ধকারেও আবছা আবছা সব দেখা যাচ্ছে। প্রায় সবই টালি আর টিনের ঘর। অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো ঘরগুলোকে রেললাইনের পাশের সেই মরা ফুলে ওঠা অতিকায় মোষটার মতো মনে হচ্ছে। ওরই মধ্যে একখানা বড়ো মতো টিনের ঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো নিতাই। চারিদিকটা আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে চাদরের তলা থেকে সিঁদকাঠিটা বের করলো। গুঁড়ি মেরে বসে পড়লো ঘরের কোণে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুলি বাঁশের বেড়ার নীচে মাটির ডোরায় বেশ বড়ো একটা